দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... JAN .....
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

সীমাহীন সমস্যায় বিপর্যস্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

কবির হোসেন

সাথে শোষণ করেই চলেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, এসব বিষয়ের শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ান। কলেজে যেদিন প্রথম নবীনবরণ হয়, সেদিনই ঐ শিক্ষক সাহেব হাতে কাগজের লিস্ট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি করেন। উদ্দেশ্য তার প্রাইভেট বা কোচিংয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ও রোল নং সংগ্রহ করা আবার যেদিন প্রথম ক্লাস হয় সেদিনই শ্রেণীকক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে মাইকে ঘোষণা দেন- তার কাছে প্রাইভেট বা কোচিং করার জন্য এভাবে নাম সংগ্রহ করে ব্যাচ তৈরি করেন। আর চলে তার ৩৬৫ দিনের মহতি কর্মকাণ্ড। কোন কোন শিক্ষকের ক্ষেত্রে শুক্রবারও বাদ যায় না। সারাবছরই তার বিদ্যা প্রদর্শনের মহতি উৎসব চলে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোচিংয়ের এ রমরমা অবস্থার জন্য সরকারী নীতিমালা বা বিধি ব্যবস্থাই দায়ী। কারণ দেখা গেছে যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যথেষ্ট বেতনভাতা পান, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, আনুতোষিক বাড়ি ভাড়া ও উৎসবভাতাসহ অন্যান্য ভাতা যথেষ্টই পান। ফলে একজন সরকারি স্কুল বা কলেজের শিক্ষক সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারেন। জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়লেও তার বেতনও সে হারে বাড়ে। ফলে মোটামুটি নিশ্চিন্তেই তার জীবন চলে। কিন্তু এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে। দেশের ৯৮% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী এসব শিক্ষকরা কেবলই নামমাত্র শিক্ষক। মূল বেতনের কেবলই ১০০% পায়। তার বাইরে বাড়ীভাড়া ১০০ টাকা, চিকিৎসা ১৫০ টাকা, আর প্রবৃদ্ধি সারা জীবন একবারই মাত্র ১২৫ টাকা, আর উৎসবভাতা বেসিক এর ২৫%। ফলে এসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সীমাহীন আর্থিক দৈন্যতায় ভোগেন। অর্থনৈতিক দৈন্যদশা তাদের এতই প্রকট যে, কখনো কখনো দু'বেলা ডাল-ভাতের যোগান পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মান-সম্মান ও ইজ্জতের ভয়ে ঐ শিক্ষক সাহেব অন্য কোন কাজে জড়িত হন। তখন উনি নিজেকে আর শিক্ষক পরিচয় দেন না। যিনি অন্যের ছেলে-মেয়েকে মানুষ করেন, অথচ তার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যত অন্ধকার। পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহের সূত্রপাতও এখান থেকেই শুরু। এর পরিণতি খুবই ভয়ানক ও ভয়ংকর হতে পারে। যা জাতির উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুধুই স্থবির হবে না; বরং কলঙ্কিতও হবে। সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এতসব বেতন ভাতার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, আরও আছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্ভট, অলৌকিক পরিচালনা পর্ষদ। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দেখভাল-এ পরিচালনা পর্ষদই করেন। শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সর্ববিধ বিষয় এদের দায়িত্ব। সরকার শুধু অনুমোদন দিয়ে থাকেন। শিক্ষক নিয়োগে এদের হাত থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম অযোগ্যরাই শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পান। এ নিয়োগের সাথে পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে এক গোপন আঁতাত হয়। আঁতাতে ঐ শিক্ষক ৪/৫ লাখ টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পান। আর নিয়োগ পাওয়ার পর শুরু হয় টাকা তৈরির মেশিনের বাটন টিপা। এ মেশিনের বাটন একবার শুরু হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকে- আজীবন। অধিকন্তু ঐ শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের কোন কোন প্রভাবশালী সদস্যদেরকে সন্তুষ্ট করতে হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ যেন ঐ পরিচালনা পর্ষদেরই সদস্য। তিনি যেন শিক্ষক নন। তিনি শিক্ষকদের সাথে কারণে অকারণে অসদাচরণ করেন। কথা ও কাজে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে শিক্ষকদেরকে অপমান অপদস্ত করেন। আর এ সবের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা আর্থিকভাবে ভালই লাভবান হন। দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠান থকে প্রদত্ত যে আর্থিক সুবিধা পান তা তারই প্রতিষ্ঠানের কর্মরত প্রায় সকল শিক্ষকদের সমষ্টির চাইতেও বেশি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক বেতনের বিনিময়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। আবার সরকারী প্রতিষ্ঠানেও মাসিক বেতন নেয়া হয়। তবে এ দুধরনের প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনের মধ্যে আছে বিরাট পার্থক্য। সরকারী প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বেতন মাসে নামমাত্র আর তা সরকারী তহবিলে জমা হয়। আর শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরকারী নিয়মে তাদের প্রাপ্য পান কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বেতন আকাশচুম্বী হলেও তা কখনো সরকারী তহবিলে জমা দেয়া হয় না। বরং তা পরিচালনা পর্ষদ তাদের ইচ্ছামত যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাজে, কখনো বা এফডিআর করে, আবার কখনো বা কোন খাতে ব্যয় করেন তা জানা যায় না। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানের আয়ের কোন অংশই কর্মরত শিক্ষকরা পান না। যা পান তা অত্যন্ত নগণ্য- নামমাত্র। তবে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ বেশ মোটা অংকের পান। একন্যই দেখা গেছে যে,-ঐসব প্রতিষ্ঠানের কর্মরত একজন প্রভাষক তারই প্রতিষ্ঠানের একজন পিয়ন-কেরানির চাইতেও কম বেতন পান। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ এর কোন সুবিচার করেন না এরূপ বিষয়ের সুবিচার করার যে নৈতিক গুণাবলী থাকা দরকার তার তাদের আদৌ নেই। সরকারী নিয়মে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের যোগ্যতার কি মানদণ্ড হবে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। আবার যতটুকু আছে তার ও কোন বাস্তবায়ন নেই। আবার বাস্তবায়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোন ধরনের মনিটরিং নেই। এ জন্য এ পরিচালনা পর্ষদই তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্তদেরকে শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ হিসাবে করে। আর সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তকে বিনা বাক্যে বাস্তবায়ন করেন। সরকারী নিয়ম কানুনের এসব ফাঁক-ফোকরের কারণে প্রজাতন্ত্রের সরকারী অর্থের অপচয় হয়। শিক্ষার মান নিম্ন হয়। আগামী প্রজন্ম মান সম্মত ও নৈতিক গুণসম্পূর্ণ শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত হয়। সর্বোপরি জাতিকে বঞ্চিত করা হয়।

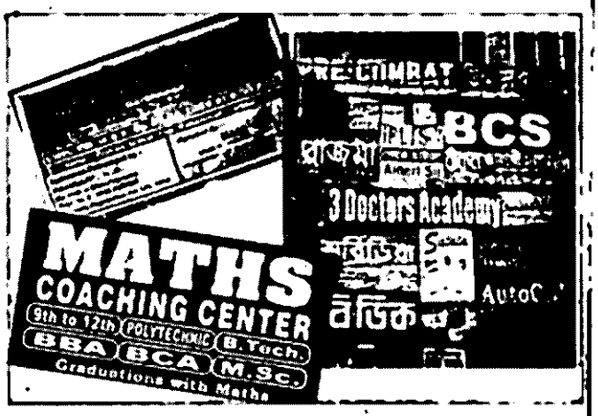

লেখক : কলেজ শিক্ষক
ই-মেইল Kabirhossain839@wmail.com

১

P.T.O